



একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম



লেখক পরিচিতি

জাহানারা ইমাম ১৯২৩ সালের ৩ মে মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল আলী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মা সৈয়দা হামিদা বেগম। জাহানারা ইমামের পারিবারিক নাম জুড়ু। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। তিনি রংপুর থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৪৪ আইএ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতার লেডি ব্রেকবোর্ন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৬০ সালে বিএড ডিগ্রি, ১৯৬৪ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি এবং ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল ও বুলবুল একাডেমির প্রধান শিক্ষক ও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুমী শহিদ হন। রুমী ও তাঁর সহযোগীদের বিভিন্ন অপারেশনে জাহানারা ইমাম সহযোগিতা করেন। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন। তিনি হন শহিদ জননী। তিনি স্মৃতিচারণমূলক ‘একাত্তরের দিনগুলি’ লিখে পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবিতে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ডেট্রয়েট হাসপাতালে ক্যান্সারের চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- শিশুসাহিত্য : গজকচ্ছপ, সাতটি তারার ঝিকিমিকি, বিদায় দে মা ঘুরে আসি;
 অনুবাদ : জাথত ধরিত্রী, তেপান্তরের ছোট্ট শহর, নদীর তীরে ফুলের মালা;
 স্মৃতিকথা : একাত্তরের দিনগুলি, ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস, প্রবাসের দিনগুলি।

ভূমিকা

জাহানারা ইমাম রচিত ‘একাত্তরের দিনগুলি’ শীর্ষক দিনপঞ্জির আকারে রচিত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ থেকে পাঠ্যভুক্ত অংশটুকু গৃহীত হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন দিনগুলিতে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা এবং জনজীবনের আতঙ্ক, দুর্ভোগ, আত্মত্যাগের কথা লেখক তাঁর এই রচনাটিতে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ পড়া শেষে আপনি—

- সাহিত্যরূপ হিসেবে দিনপঞ্জির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অবরুদ্ধ ঢাকার সার্বিক আবহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মানুষের আত্মত্যাগ আর প্রতিরোধ-সংগ্রামের বিবরণ লিখতে পারবেন;
- একটি পরিবারের যুদ্ধকালীন অবস্থার সূক্ষ্ম পরিচয়লিপি তৈরি করতে পারবেন।



পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ ঢাকার বিবরণ লিখতে পারবেন;
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানামাত্রিক নিপীড়নের পরিচয় লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

১৩ই এপ্রিল : মঙ্গলবার ১৯৭১

চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুশলধারেই যে হলো, রোববার তো সারা দিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারা দিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে রোদ দেখা গেছে। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। জামী ছড়া কাটছিল, ‘রোদ হয় বৃষ্টি হয়, খ্যাক-শিয়ালির বিয়ে হয়।’ কিন্তু আমার মনে পাষণ্ডভার। এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই, ঘনঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্ভোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এই রকম সময়ে করিম এসে ঢুকল ঘরে, সামনে সোফায় বসে বলল, ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না?’

‘কোথায় যাব? অন্ধ, বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে কেমন করে যাব? কিন্তু এ পাড়া ছেড়ে লোকে যাচ্ছে কেন? এখানে তো কোনো ভয় নেই!’

‘নেই, মানে? পেছনে এত কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো-’

‘হল তো সব খালি, বিরান, যা হবার তাতো প্রথম দুদিনেই হয়ে গেছে। জানো বাবুদের বাড়িতে তার মামার বাড়ির সবাই এসে উঠেছে শান্তিনগর থেকে?’

‘তাই নাকি? আমরা তো ভাবছিলাম শান্তিনগরে আমার দুলাভাইয়ের বাসায় যাব।’

‘তাহলেই দেখ- ভয়টা আসলে মনে। শান্তিনগরের মানুষ এলিফ্যান্ট রোডে আসছে মিলিটারির হাত থেকে পালাতে, আবার তুমি এলিফ্যান্ট রোড থেকে শান্তিনগরেই যেতে চাচ্ছ নিরাপত্তার কারণে।’

যুক্তিটা বুঝে করিম মাথা নাড়ল, ‘খুব দামি কথা বলেছেন ফুফুজান। আসলে যা কপালে আছে তা হবেই। নইলে দ্যাখেন না, ঢাকার মানুষ খামোকা জিজিরায় গেল গুলি খেয়ে মরতে। আরো একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।’

শিউরে উঠে বললাম, ‘রোজই শুনছি করিম। যেখানেই যাই এছাড়া আর কথা নেই। কয়েকদিন আগে শুনলাম ট্রাকভর্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাত আর চোখ বেঁধে, কতো লোকে দেখেছে। এখন শুনছি সদরঘাট, সোয়ারীঘাটে নাকি দাঁড়ানো যায় না পচা লাশের দুর্গন্ধে। মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এজন্যে।’

১০শে মে : সোমবার ১৯৭১

বেশ কিছুদিন বাগানের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আজ সকালে নাশতা খাবার পর তাই বাগানে গেলাম। বাগানে বেশ কটা হাই-ব্রিড টি-রোজের গাছ আছে। এই ধরনের গোলাপ গাছের খুব বেশি যত্ন করতে হয়- যা গত দুমাসে হয়নি। খুরপি হাতে কাজে লাগার আগে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মাখনের মতো রঙের ‘পিস’ অর্থাৎ ‘শান্তি’। কালচে-মেরুর ‘বনি প্রিন্স’ আর ‘এনা হার্কনেস’। ফিকে ও গাঢ় বেগুনি রঙের ‘সিমোন’ আর ‘ল্যাভেন্ডার’। হলুদ ‘বুকানিয়ার’, সাদা ‘পাস্কালা’।

বনি প্রিন্স-এর আধফোটা কলিটি এখনো আমার বেড-সাইড টেবিলে কালিদানিতে রয়েছে। কলি অবশ্য আর নেই, ফুটে গেছে এবং প্রায় বারে পড়ার অবস্থা। ‘পিস’-এর গাছটায় একটা কলি কেবল এসেছে- যদিও সারাদেশ থেকে ‘পিস’ উধাও।



বাগান করা একটা নেশা। এ নেশায় দুঃখ-কষ্ট খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যায়। গত কয়েক মাস ধরে নেশাটার কথা ভাববারই অবকাশ পাইনি। এখন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যস্ত রাখার গরজেই বোধ করি নেশাটার কথা আমার মনে পড়েছে।

১২ই মে : বুধবার ১৯৭১

জামীর স্কুল খুলেছে দিন দুই হলো। সরকার এখন স্কুল-কলেজ জোর করে খোলার ব্যবস্থা করছে। এক তারিখে প্রাইমারি স্কুল খোলার লক্ষ্যে, নয় তারিখে মাধ্যমিক স্কুল।

জামী স্কুলে যাচ্ছে না। যাবে না। শরীফ, আমি, রুমী, জামী- চারজনে বসে আলাপ-আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। দেশ কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না, দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা। দেশবাসীর ওপর হানাদার পাকিস্তানি জানোয়ারদের চলছে নির্মম নিষ্পেষণের স্টিমরোলার। এই অবস্থায় কোনো ছাত্রের উচিত নয় বই-খাতা বগলে স্কুলে যাওয়া।

জামী অবশ্য বাড়িতে পড়াশোনা করছে। এবার ও দশম শ্রেণির ছাত্র। রুমী যতদিন আছে, ওকে সাহায্য করবে। তারপর শরীফ আর আমি-যে যতটা পারি।

জামী তার দুতিনজন বন্ধুর সাথে ঠিক করেছে- ওরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে পড়াশোনা করবে। এটা বেশ ভালো ব্যবস্থা, পড়াও হবে, সময়টাও ভালো কাটবে। অবরুদ্ধ নিক্রিয়তায় ওরা হাঁপিয়ে উঠবে না।

১৭ই মে : সোমবার ১৯৭১

রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোথাম করিয়েও ‘কর্তাদের’ তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধ হয়! তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধরে ধরে তাদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো টিচার, রেডিও-টিভির কোনো কর্মকর্তা ও শিল্পীর নাম বাদ গেছে বলে মনে হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে এবং সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর যে বিবৃতি তাঁদের নামে বেরিয়েছে, সেটা যে তাঁরা অনেকে না দেখেই সই করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। আজ সকালের কাগজে বিবৃতিটি প্রথমবারের মতো পড়ে তাঁরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইবেন খানিকক্ষণ! এবং বলবেন, ধরণী দ্বিধা হও! এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি স্বয়ং গোয়েবলসও লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই পূর্ব বাংলার কোন প্রতিভাধর বিবৃতিটি তৈরি করেছেন, জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবকাশ- অবসর; বিরাম। **অবরুদ্ধ**- আটক; বেষ্টিত। **অবরুদ্ধ নিক্রিয়তা**- রুদ্ধ বা আটক অবস্থায় কর্মহীন। **কূটকৌশল**- চতুরতা; দুর্বুদ্ধি। **খুরপি**- মাটি খোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার ছোট হাতিয়ার। **গোয়েবলস (১৮৯৭-১৯৪৫)**- জার্মানি বংশদ্ভূত হিটলারের সহযোগী; রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও মিথ্যা রটনার প্রবর্তক। **জামী**- লেখিকার ছোট ছেলে। **নিক্রিয়**- ক্রিয়াহীন বা কাজহীন। **নিষ্পেষণ**- সম্পূর্ণরূপে চূর্ণকরণ; মর্দন। **পাষণ্ডভার**- হৃদয়হীন অবস্থা। **পিস**- শান্তি। **বিরান**- জনমানবহীন; পরিত্যক্ত; ফাঁকা। **বিক্ষিপ্ত**- অস্থির; ব্যাকুল। **বিবৃতি**- বিবরণ; বর্ণনা; মতামত প্রকাশ। **বেয়নেট**- বন্দুকের সজ্জিন; এখানে বন্দুকের অগ্রভাগে লাগানো একপ্রকার বিষাক্ত ও ধারালো ছোরা বোঝানো হয়েছে। **মুশলধারে**- অজস্র ধারায়; প্রচুর পরিমাণে। **রুমী**- জামীর বাবা। **শরীফ**- লেখিকার স্বামী। **স্তম্ভিত**- হতবাক; বিস্মিত।



সারসংক্ষেপ :

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা ঢাকায় থেকে গিয়েছিল বা থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। ঢাকা তখন এক অবরুদ্ধ নগরী। চারিদিকে মৃত্যুর সংবাদ। হানাদার বাহিনীর বীভৎসতার চিহ্ন। স্বাভাবিক জীবনযাপনের কোনো উপায় ছিল না। সরকার অবশ্য প্রচার করেছে, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক। তারা স্কুল-কলেজ চালানোর চেষ্টা করেছে। জোর করে টিভি-রেডিওতে অনুষ্ঠান করতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের দিয়ে জোর করে বিবৃতি প্রচার করিয়েছে। এ এক আতঙ্কের সময়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘একাত্তরের দিনগুলি’ কোন ধরনের রচনা?

ক. ভ্রমণ কাহিনি	খ. রম্যরচনা
গ. গীতিনাট্য	ঘ. স্মৃতিচারণমূলক
২. ‘মুক্তিফৌজ’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

ক. মুক্তিবাহিনী	খ. পাকিস্তানি বাহিনী
গ. আনসার বাহিনী	ঘ. উপকূল রক্ষীবাহিনী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘রাইফেল রোটি আওরাত’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন। রাজনীতির বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, কবিতাচর্চাই যার নেশা। তাকেও শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছে।

৩. উদ্দীপকটি ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনায় যাদের প্রতিনিধিত্ব করে—

ক. শিল্পী-বুদ্ধিজীবী	খ. কৃষক-শ্রমিক
গ. জেলে-মাঝি	ঘ. আউল-বাউল
৪. উদ্দীপক ও ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার বুদ্ধিজীবীদের সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে—

i. দেশপ্রেম ও স্বাধিকার চেতনায়	ii. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে	iii. পলায়নী মনোবৃত্তিতে
---------------------------------	----------------------------	--------------------------

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii	গ. iii	ঘ. i, ii
------	-------	--------	----------

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আনন্দ ও বিষাদে মানুষের অনুভূতির সূক্ষ্ম পরিচয় লিখতে পারবেন;
- মানুষের আত্মত্যাগ আর প্রতিরোধ-লড়াইয়ের নানা ধরন চিহ্নিত করতে পারবেন।



মূলপাঠ

২৫শে মে : মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী। বেশ শান-শওকতের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ঢাকায়। এমনকি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যন্ত একটা অনুষ্ঠান করছে।

সন্ধ্যার পর টিভির সামনে বসেছিলাম, জামী সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, ‘মা শিগগির এস। নতুন প্রোগ্রাম।’ দৌড়ে ওপরে গেলাম, স্বাধীন বাংলা বেতারে বাংলা সংবাদ পাঠ করছে নতুন এক কণ্ঠস্বর। খানিক শোনার পর চেনা চেনা ঠেকল কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না। সালেহ আহমদ নামটা আগে কখনো শুনি নি। রুমী বলল, ‘নিশ্চয় ছদ্মনাম।’ বললাম, ‘হতে পারে। তবে ঢাকারই লোক এ। এই ঢাকাতেই এই গলা শুনেছি। হয় নাটক, নয় আবৃত্তি।’ এইসব গবেষণা করতে করতে বাংলা সংবাদ পাঠ শেষ।

আজকের প্রোগ্রামেও বেশ নতুনত্ব। কণ্ঠস্বরও সবই নতুন শুনছি। একজন একটা কথিকা পড়লেন— চরমপত্র। বেশ মজা লাগল শুনতে, শুদ্ধ ভাষায় বলতে বলতে হঠাৎ শেষের দিকে একেবারে খাঁটি ঢাকাইয়া ভাষাতে দুটো লাইন বলে শেষ করলেন।

অদ্ভুত তো। কিন্তু এখানে আলটিমেটামের মতো কিছু তো বোঝা গেল না।



শরীফ বলল, ‘ঐ যে বলল না একবার যখন এ দেশের কাদায় পা ডুবিয়েছ, আর রক্ষা নেই। গাজুরিয়া মাইরের চোটে মরে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হবে, এটা আলটিমেটাম।’

‘কি জানি।’

জামী জানতে চাইল, ‘গাজুরিয়া মাইর কি জিনিস?’

রুমী বলল, ‘জানি না। আমার ঢাকাইয়া বন্ধু কাউকে জিগ্যেস করে নেব।’

ঐ যে মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতার কথা বলল— ঢাকার ছ’জায়গায় থ্রেনেড ফেটেছে, আমরা তো সাত আটদিন আগে এ রকম বোমা ফাটার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি! সত্যি সত্যি তাহলে ঢাকার আনাচে-কানাচে মুক্তিফৌজের গেরিলারা প্রতিঘাতের ছোট ছোট স্কলিঙ্গ জ্বালাতে শুরু করেছে? এতদিন জানছিলাম বর্ডারঘেঁষা অঞ্চলগুলোতেই গেরিলা তৎপরতা। এখন তাহলে খোদ ঢাকাতোও?

মুক্তিফৌজ ! কথাটা এত ভারি যে এই রকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ঐ অবিশ্বাসের ভেতর থেকে একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে।

৫ই সেপ্টেম্বর : রবিবার ১৯৭১

একটা কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে গত দুদিন থেকে শরীফ আর আমি খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। রুমীকে কি করে বের করে আনা যায়, তা নিয়ে শরীফের বন্ধুবান্ধব নানারকম চিন্তাভাবনা করছে। এর মধ্যে বাঁকা আর ফকিরের মত হলো : যে কোন প্রকারে রুমীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। বাঁকা আর ফকির মনে করছে— শরীফকে দিয়ে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা মার্সি পিটিশন করিয়ে তদবির করলে রুমী হয়তো ছাড়া পেয়ে যেতেও পারে।

রুমীর শোকে আমি প্রথম চোটে ‘তাই করা হোক’ বলেছিলাম। কিন্তু শরীফ রাজি হতে পারছে না। যে সামরিক জাস্তার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমী তাহলে আমাদের কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছে — ছেলের প্রাণটা আগে। রুমীর মতো এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল। কিন্তু শরীফ তবু মত দিতে পারছে না। খুনী সরকারের কাছে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে দয়াভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা, রুমীর উঁচু মাথা হেঁট করা। গত দুরাত শরীফ ঘুমোয় নি, আমি একবার বলেছি, ‘তোমার কথাই ঠিক। ঐ খুনী সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা যায় না।’ আবার খানিক পরে কেঁদে আকুল হয়ে বলেছি, ‘না, মার্সি পিটিশন কর।’

এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দুদিন দুরাত। শেষ পর্যন্ত শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে— না, মার্সি পিটিশন সে করবে না। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমিও শরীফের মতকে সমর্থন করেছি। রুমীকে অন্যভাবে বের করে আনার যতরকম চেষ্টা আছে, সব করা হবে; কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয়।

১১ই অক্টোবর : সোমবার ১৯৭১

শরীফ বলল, ‘সেই যে মাস খানেক আগে কাগজে পড়েছিলাম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিয়ুর রহমানের কথা, তার সম্বন্ধে আজ শুনে এলাম।’

‘কী শুনে এলে? কোথায় শুনলে?’

‘ডাঃ রাব্বির কাছে। রাব্বি— জানোতো, আমাদের সুজার ভাস্তে।’

শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সুজা সাহেব, তাঁর ভাস্তে ডাঃ ফজলে রাব্বি।

শরীফ বলল, ‘আজ ফকিরের অফিসে গেছিলাম, ওখানে রাব্বির সঙ্গে দেখা। ওর মুখেই শুনলাম মতিয়ুর রহমানের ফ্যামিলি ২৯ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে ঢাকা এসেছে। মতিয়ুর রহমানের শ্বশুর গুলশানের এক বাড়িতে থাকেন। সেইখানে ৩০ তারিখে মতিয়ুরের চলিচশা হয়েছে। রাব্বি গিয়েছিল চলিচশায়। মিসেস মতিয়ুর নাকি বাংলা বিভাগের মনিরঞ্জামানের শালী।’



‘আমাদের স্যার মনিরুজ্জামানের? তার মানে ডলির বোন? দাঁড়াও, দাঁড়াও- এই বোনকে তো দেখেছি ডলিদের বাসায়- মিলি এর নাম।’

ডলির কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ডলি, মনিরুজ্জামান স্যার, ওদের কোনো খোঁজই জানি না। দুটো বাচ্চা নিয়ে কোথায় যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে- কে জানে। ওপারেও যায়নি, গেলে বেতারে নিশ্চয় গলা শুনে পেতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারে বহু পরিচিতজনের গলা শুনি, তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করে, কিন্তু গলা শুনে চিনতে পারি। প্রথম যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে সালেহ আহমদের কণ্ঠে খবর শুনি, খুব চেনা- চেনা লেগেছিল, দু একদিন পরেই চিনেছিলাম- সে কণ্ঠ হাসান ইমামের। ইংরেজি খবর ও ভাষ্য প্রচার করে যারা, সেই আবু মোহাম্মদ আলী ও আহমেদ চৌধুরী হলো আলী যাকের আর আলমগীর কবির। গায়কদের গলা তো সহজেই চেনা যায়-রথীন্দ্রনাথ রায়, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, হরলাল রায়। কথিকায় সৈয়দ আলী আহসান, কামরুল হাসান, ফয়েজ আহমদ প্রায় সকলেরই গলা শুনে বুঝতে পারি। নাটকে রাজু আহমেদ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়- এদের সবার গলাই এক লহমায় বুঝে যাই।

১৬ই ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সকাল নটা পর্যন্ত যে আকাশযুদ্ধ বিরতির কথা ছিল, সেটা বিকেলে তিনটে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দুপুর থেকে সারা শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। পাকিস্তানি আর্মি নাকি সারেভার করবে বিকেলে। সকাল থেকে কলিম, হুদা, লুলু যারাই এলো সবার মুখেই এক কথা। দলে দলে লোক জয় বাংলা ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে। পাকিস্তানি সেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথেঘাটে এলোপাখাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন-জখম করে যাচ্ছে। মঞ্জুর এলেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, গাড়ির ভেতরে বাংলাদেশের পতাকা বিছিয়ে। তিনিও ঐ এক কথাই বললেন। বাদশা এসে বলল, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরসের মলিক খান জীপে করে পালাবার সময় বেপরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহু লোক জখম করেছে।

মঞ্জুর যাবার সময় পতাকাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, ‘আজ যদি সারেভার হয়, কাল সকালে এসে পতাকাটা তুলব।’

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ কে খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

জেনারেল নিয়াজী নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আজ বিকেল তিনটের সময়। যুদ্ধ তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব?

আমি গেস্টরুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মসলা বের করলাম কুলখানির জর্দা বাঁধবার জন্য। মা, লালু, অন্যান্য বাড়ির গৃহিণীরা সবাই মিলে জর্দা বাঁধতে বসলেন।

রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাশতার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম মসলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আলাটিমেটাম- চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ। **কথিকা**- নির্দিষ্ট ও ক্ষুদ্র আকারের বর্ণনাত্মক রচনা। **কারফিউ**- নির্ধারিত সময়ে বাড়ির বাইরে বা রাস্তায় না যাওয়ার নির্দেশ। **গাজুরিয়া মাইন**- গজারি কার্ঠের মতো শক্ত ও ভারি কার্ঠের লাঠি দিয়ে মার দেওয়া। **গেরিলা**- আক্রমণকারী। **চরমপত্র**- মৃত্যুর পূর্বসময়ে লিখিত উপদেশ; শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়ার জন্য প্রেরিত পত্র; ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে হানাদার বাহিনীর অপকৃতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য নিয়ে হাস্যরসাত্মক কথিকা প্রচারিত হতো। এই কথিকাগুলো চরমপত্র নামে খ্যাত। **জন্মজয়ন্তী**- কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব। **মার্সি পিটিশন**- শাস্তি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন; ক্ষমা ভিক্ষার আবেদনপত্র। **লহমায়**- মুহূর্তে। **স্কুলিঙ্গ**- অগ্নিকণা; আগুনের ফুলকি।



বিপর্যয় আর দুঃখের মধ্যে কখনো কখনো আনন্দের ঘটনাও ঘটত। বিশেষত স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান বা মুক্তিযোজের খবর মানুষকে আনন্দিত করত। তবে বিপর্যয়ের সংবাদই আসত বেশি। মতিয়ুর রহমান আর বেঁচে নেই বা মনিরুজ্জামান স্যারের পরিবারের কোনো খবর আজো পাওয়া যায়নি – এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই কেটেছে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস। তবে লেখিকা সবচেয়ে বড় সংকটের মুখে পড়েছেন হানাদার বাহিনীর হাতে বড় ছেলে রুমী আটক হওয়ার ঘটনায়। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে বলেছেন কেউ কেউ। মায়ের মন গুরুতে এ প্রস্তাবে সায়াও দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর স্বামী সিদ্ধান্ত নেন, হানাদার বাহিনীর কাছে প্রাণভিক্ষা কিছুতেই নয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্যাগের এবং প্রতিরোধের; সেসঙ্গে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠারও বটে।



ঘ. i, ii ও iii



ঘ. iii



সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’র ভূমিকা অপরিসীম। বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন, উজ্জীবিত করেছেন। এ বেতার কেন্দ্রে বাংলার লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, কলাকুশলী এবং শব্দসৈনিকেরাও জড়িত ছিলেন। বেতারের মাধ্যমে তাঁরা উন্নত চিন্তা, ন্যায়নিষ্ঠা ও মানবতাবোধের প্রচার করেছেন। বলাবাহুল্য যে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত বিপ্লব ঘটেছে তার অনেকগুলোর নেপথ্যে রয়েছে শিল্পী, কুশলী আর বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক প্রয়াস।

ক. গোয়েবলস্ কে?

খ. ‘মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এ জন্যে।’ –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার কোন অংশের প্রতিফলন ঘটিয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

চিঠিটা তার পকেটে ছিল

ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

‘মাগো, ওরা বলে

সবার কথা কেড়ে নেবে

তোমার কোলে শুয়ে

গল্প করতে দেবে না

বলো মা,

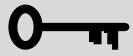
তাই কি হয়?

ক. জেনারেল নিয়াজি কত হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন?

খ. ‘এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটেছে দুই রাত।’ –কে, কেন, একথা বলেছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “তারুণ্যের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই আমাদের একাত্তরের অর্জন স্বাধীনতা।” –উদ্দীপক ও ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. গোয়েবলস্ হলেন জার্মান বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ। তিনি হিটলারের সহযোগী এবং রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও মিথ্যা রটনার প্রবর্তক ছিলেন।

খ. ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনায় নদীতে বহু মানুষের পচা লাশ ভেসে যাওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখক মাছ খাওয়া বাদ দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নদীতে বহু লাশ ভেসে যায়। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ। সদরঘাট ও সোয়ারিঘাটে সেই পঁচা লাশের দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যায় না। এসব কারণে লেখক মাছ খাওয়া বাদ দিয়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকের ভাবনা ‘একাত্তরের দিনগুলি’ দিনপঞ্জিতে আলোচিত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের ভূমিকার বিষয়টি উন্মোচিত করেছে।

ভারত থেকে পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন এদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া গীতিকার, আবৃত্তিকার, শিল্পীসহ অনেকে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই বেতার থেকে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল, পাশাপাশি অপারেশন চালানোর দিকনির্দেশনাও দিত।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রাখতে স্বাধীন বাংলা বেতারের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এই যুদ্ধে শিল্পী, কলাকুশলীসহ শব্দ-সৈনিকদেরও ভূমিকা ছিল। তাছাড়া তারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের উজ্জীবিত করে আসতেন। ‘একাত্তরের দিনগুলি’ দিনপঞ্জিতেও মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীদের নানা ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত রাখতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। যুদ্ধকালীন



দিকনির্দেশনা বা মেসেজও এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সাংকেতিক ভাষায় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠানো হত। তাই বলা যায় দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদানের দিকটিই উদ্দীপকটিতে উন্মোচিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার সমগ্র অনুভবকে ধারণ করে না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বেতার মাধ্যম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। এ সময় মানুষ বেতারের উপর নির্ভর করত। বেতারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথিকা, চরমপত্র, গণসঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ বেতারের মাধ্যমে সারা দেশের জনগণকে জানানো হত।

‘একাত্তরের দিনগুলি’ দিনপঞ্জিটিতে জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ভয়াল অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। আতঙ্কিত মানুষের উৎকণ্ঠিত জীবন-যাপন, হানাদারদের অত্যাচার, স্বাধীনতা অর্জনসহ অনেক বিষয় এখানে এসেছে। উদ্দীপকে শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রসঙ্গ এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনায় পুরো মুক্তিযুদ্ধকালের আবহ ফুটে উঠেছে। সেখানে হানাদারদের নির্যাতন, মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা, যুদ্ধকালীন মানুষের আতঙ্কিত জীবন যাপন, বুদ্ধিজীবী নির্যাতন, নির্যাতকদের আত্মসমর্পণ প্রভৃতি দিক ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে এসেছে কেবল মুক্তিযুদ্ধকালের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কলাকুশলী, শিল্পী ও শব্দ-সৈনিক তথা গীতিকারদের ভূমিকার কথা। এটি ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার নানা দিকের একটি খণ্ড দিক। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার সমগ্র অনুভবকে ধারণ করেনি।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মেলাঘরে ট্রেনিংয়ে গিয়ে দেখি ঢাকার যত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা, ধানমন্ডি, গুলশানের বড়লোক বাপের গাড়ি হাকানো ছেলেরা, খেলার মাঠের চৌকস ছেলেরা, ছাপোষা চাকুরের বাপের ছেলেরা, সবাই জড়ো হয়েছে ওখানে। সবাই গেছে যুদ্ধ করার জন্য, এর বেশির ভাগ ঢাকার ছেলে। আমরা আছি সেক্টর টুতে। রেগুলার আর্মির পাশাপাশি আমরা আছি গেরিলা বাহিনী হিসাবে।

১. ‘চরমপত্র’ কী?
২. ‘গাজুরিয়া মাইর’ বলতে কী বোঝায়?
৩. উদ্দীপকে ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. ‘একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির সর্বজনীন গণযুদ্ধ।’ –উদ্দীপক ও ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. ঘ ৯. খ ১০. গ ১১. খ ১২. খ



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।



অডিও/ভিডিও

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।